নিবেদন
AMSTELVEEN
সার্বজনীন
PRESENTS
www.hoichoi.nl
2022
EDITION
"পুজোটা হোক পুজোর মতো
সঙ্গে থাকুক পঞ্চ-প্রদীপ, বন্ধু-বরণ।"
INDIANA
HOICHOI
BENGALI
COMMUNITY
OF THE
NETHERLANDS

Certified and Qualified

Counsellor & Life Coach

Specifically for Teenagers

TEEN VITALITY

Be Your ★ Best Self

A dedicated professional is ready to listen to you

Over 20 years' experience supporting & nurturing teenagers

Want to raise your self-esteem, increase your resilience and/or need help with direction & making smart life choices? Is there something holding you back from living a happy and fulfilling life? Teen Vitality is committed to support you to be a happier, healthier and more positive young adult.

hunter.teenvitality@gmail.com

www.teenvitality.nl

Certified Life Coach Institute C.L.C.

Institute of Counselling
experts in clinical and pastoral counselling

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

পুজোটা হোক
উৎপল চক্রবর্তী ৯

দূর্গা পুজোয় কলকাতায় কদিন
অর্চনা পাল ১১

অণু-চার
ফায়েজ আহমেদ ফায়েজ ১৪

স্বামী ডিয়েগো'র সাথে ফ্রিদা কাহলো'র আলাপচারিতা অবলম্বনে
তানবীরা হোসেন ১৮

'যতদিন বাঁচবো অভিনয় করে যাবো।'
শতরূপা বোস রায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে
বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ১৯

‘বর্তমান যুগের পরিচালকদের মধ্যে আর-একটা হীরক রাজার দেশে বানানোর মতো মেধা ও সৃজনশীলতা নেই।’
পরিচালক **শুভ্রজিৎ মিত্রের** সঙ্গে সাক্ষাৎকারে **অগ্নিভ সেনগুপ্ত** ২৩

মা, বাবা ও অভাগিনী
অরুণাশিস সোম ২৬

The Boy and the Alien
Arjun Choudhury ২৭

PAINTING
Shreyashi Danda ৩২

Laxmi by Colour Your Dreams
(Anindita Bhattacharya) ৩৩

Hoichoi Photo Feature ৩৪

সম্পাদকীয়

প্রতিদিন ভোর বেলা ঘুম ভেঙে উঠে সূর্য্য প্রণাম করে এক তলায় নেমে বাগানের দিকটায় এসে দাঁড়াই কিচ্ছুক্ষণ। এই সময়টায় গাছের রং কেমন পাল্টে যায়। ভোরের আলোয় সেই লাল হলুদ পাতাগুলোকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে। তারপর চায়ের জলে ফুট ধরলেই আবার সেই পরবাসের দৈনন্দিনে অবগাহন। এরই মধ্যে আমি খুঁজে বেড়াই আমার মেয়েবেলার মুহূর্ত, কাক ভোরের সেই ছোট্ট চড়াই, সদরে গঙ্গা জল ছেটানো, প্রথম চায়ের জলে টগবগ শব্দ, ধোঁয়া ওঠা চিনি দেওয়া গরম দুধের গন্ধ। এই বাসরেও তার অনেকটা যাপন করি আমি কিন্তু সে বড়োই যান্ত্রিক। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি প্রহর যাপন। যার মধ্যে বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া প্রায় দুরূহ।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও ঘুম ভেঙে উঠে বাগানের দরজা খুলতেই চোখে পড়ল বাগানে ফোটা কাশ ফুল গুলো। মেঘ ভেজা প্রথম সূর্য্যের আলোয় কেমন ঝক ঝক করছে। একটা ঠান্ডা হওয়ার পরশ এসে লাগলো আমার চোখে মুখে। কয়েকটা ম্যাগপাই রোজ ভোর বেলা জল খেতে আসে আমার বাগানে। সেই মাটির পাত্রে জল রাখতে গিয়ে কাঠের জুতো পায়ে গলিয়ে যখন বাগানে গেলাম, মনে হল একবার কাশ ফুলগুলো হাত দিয়ে দেখি। সদ্য জাতের প্রতি যেমন একটা আকর্ষণ জন্মায় ঠিক তেমনি আকর্ষণ অনুভব করলাম ওই সদ্য প্রস্ফুটিত আগমনীর ফুলগুলোর প্রতি। এই সময়টায় অন্য গাছের পাতা ঝরার বেলা। ডালে ডালে মর্মর ধ্বনির মাঝে বিদায় বেলার ক্রন্দন ধ্বনিত হয় যেন।

ভোরের স্তব্ধতার মাঝে কাশ ফুলগুলো হাতে নিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো পুজো তো এসে গেছে। নীল আকাশ, সাদা মেঘ, কাশের গুচ্ছ এই পরবাসে প্রকৃতিও কেমন নিরলংকার ভাবে তার আগমন বার্তা বহন করে এনেছে। আমি আকাশের দিকে মাথা তুলে চাইলাম। শরতের আকাশে মেঘের গায়ে সোনালী রোদ লেগেছে। ভেজা ঠান্ডা হাওয়া আমার মুখে এসে লাগলো। চোখটা বন্ধ হয়ে এলো।

একটা ছোট্ট মেয়ে। নতুন জামা পরে ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। পুজোর প্যান্ডেলে সানাইয়ে ভৈরবীর সুর ভেসে আসছে, হঠাৎ ঢাক বেজে উঠলো। মেয়েটি বায়না ধরলো তার বাবার কাছে সে কলা বৌ স্নান করাতে বড় গঙ্গায় যাবে। বাবা বললেন, 'না না বড় হয়েছো, পাড়ার ছেলে পিলেদের সঙ্গে একা গঙ্গার ঘাটে যাবার দরকার নেই' . মেয়েটি নাছোড়বান্দা। পুজো বলে কথা, বাবা বললেন, 'ঠিক আছে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।' কলা বৌ ফিরলে তবে পুজো শুরু হলো। সকালের জল খাবারে ঠাকুমা গরম লুচি আর আলু চচ্চড়ি বানিয়েছে। তা ছাড়া পাড়ার প্যান্ডেলে, মোড়ের মাথার মিষ্টির দোকানের জিলিপি সিঙ্গারা তো আছেই। কিন্তু অঞ্জলি দেওয়া হয়নি যে? স্নান সেরে নতুন জামা গলিয়ে আবার প্যান্ডেলে ছুট। ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করার আপ্রাণ চেষ্টা। তারপর লুচি মোহনভোগ। সিঙ্গারা কচুরি। মা যে এই

দিনগুলোতে কিছু বলেনা। হাতে দশ টাকা দিয়েছে বাবা। যত ইচ্ছে লজেন্স আর চিপস কিনে খাও। বিকেলে ফুচকাওয়ালা যে কখন বসবে? এই সব ভাবতে ভাবতে অন্য পাড়ার এক দল ছেলেমেয়ে এসে হাজির। 'কিরে আমাদের ঠাকুর দেখতে যাবি না?' অমনি দৌড়ে আবার বাবার কাছে পারমিশন। 'আচ্ছা যাও!' তারপরেই দে দৌড়. অন্য পাড়ায় কাকিমারা নাড়ু সন্দেশ হাতে গুঁজে দেন। 'আরেকবার অঞ্জলি দিবি নাকি?' তারপর আড্ডা। গান শোনা, পুজোর নতুন গান। মাইকে সারা পাড়া জুড়ে বাজছে কিন্তু তবুও সেই নতুন হাতে পাওয়া ওয়াকম্যান। পুজোয় পিসি মাসির টাকা জমিয়ে কেনা। ক্যাসেট কিনবে বলে কত না বায়না।

দুপুর বারোটার মধ্যে পাড়া টহল দিয়ে বাড়ি। প্যান্ডেল তখন খালি। বাবা কাকারা তখন পংতি ভোজনের আয়োজন করছে। ছোট মেয়েটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাত ধরে নিয়ে আসছে প্যান্ডেলে। আগে পাড়ার বড়োরা তারপর ছোটরা, তারপর মা কাকিমা জেঠিমা। সব শেষে ছেলেরা। পাত উঠতে উঠতে বিকেল চারটে। মায়েরা পানের বাটা নিয়ে আলোচনা করছে, বিকেলে কোন শাড়িটা পরবে, আর মেয়েদের দল অপেক্ষা করে আছে কখন ফুচকাওয়ালাটা আসবে। আজ জমিয়ে ফুচকা খাবে। তারপর নাগরদোলা? সেতো একটু দূরে মাঠে মেলায় যেতে হবে, কে জানে বাবা আবার যেতে দেবেন কিনা। জল্পনা কল্পনা করতে করতে শাঁখ বেজে উঠলো। ঠাকুরমশাই সন্ধ্যা আরতির জন্য এসে গেছেন। মায়েরা আবার ময়দা মাখতে বসেছেন, সঙ্গে হালুয়া আর মিষ্টি তো আছেই। ভিয়েনের ঠাকুর আর জোগাড়ে দাদা পঞ্চপ্রদীপ খানা তেঁতুল দিয়ে মেজে চক চকে করে দিয়েছে। আবার সাজানো হয়েছে মোমবাতি, ঘিয়ের প্রদীপ, তেলের প্রদীপ, মোম বাতি।

পুজোর সেক্রেটারি জেঠিমার আঁচলে ঝুলছে ভাঁড়ারের চাবি। ক কেজি চিনি, ক কেজি ময়দা, সব হিসেব করে বের করা হয়েছে সন্ধের আগেই।

অষ্টমীর সকালে নতুন শাড়ি পরে অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেছে। আজ বাবার নর্থ কলকাতার ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাবে পাড়ার সব ছোটদের। ট্যাক্সি এসে গেছে। দুটো। প্রায় দশ বারো জন। গাদাগাদি করে ট্যাক্সি তে উঠে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে সারাদিন ঠাকুর দেখা। দুপুরে রাস্তায় বসা কোনো একটা স্টল থেকে যার যা ইচ্ছে খাওয়া। আজ তো পাড়ায় মা কাকিমাদের নিরামিষ। রাত্রে সব থেকে ভালো জামাটা পরে আবার আলো দেখতে বেরোনো। এদিকে পায়ে একটা বড় ফোস্কা। নতুন জুতোটা বড্ডো জ্বালাচ্ছে। রাত জেগে সাউথ কলকাতার সব পুজো দেখে ভোরবেলা বাড়ি ফেরা।

নবমীর দিন রেস্তোরাঁয় লাইন। মারা সারা পুজো খেটে খেটে অস্থির। এই একটা দিন মায়েদের ছুটি, বিকেলে। আরতি হয়ে গেলে, নতুন কাপড় পরে বাবা মা-র সঙ্গে রেস্তোরাঁয় গিয়ে চাইনিস খাওয়া। রাত্রে প্যান্ডেলে ফেরার পরেই মনটা কেমন খারাপ। পরের দিন ভোর বেলা ওঠা নেই, অঞ্জলি নেই, ঠাকুরমশাই বিসর্জন দিয়ে চলে গেছেন। রাত্রে লরি আসবে।পাড়ার ছোটরা বড়ো গঙ্গায় বিসর্জনে যায় না। পাড়ার মহিলারা আবার রান্না ঘরে ঢুকে বিজয়ার মিষ্টি, ঘুগনি, নিমকি বানানোর কাজে লাগে।

মেয়েটির তখন চোখ ভর্তি জল। পুজো শেষ।

'কি ভাবছো মা? তোমার চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল?' সত্যি তো আমি তো আর সেই ছোট্টটি নেই। আমার ছোটবেলা যে আমায় ছেড়ে কবে পারি দিয়েছে এই পরবাসে। ১৫ বছর হয়ে গেছে। কয়েকটা কাশফুল তুলে এনে ঘরের মধ্যে রাখলাম। আমার মেয়ে বললো, এবার পুজো কবে? আমি বললাম, 'সোমবার থেকে শুক্রবার।' সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'স্যাড, তাহলে তো আর যাওয়া হবে না, আমার যে ওই উইকে পরীক্ষা আছে।' তবুও ঠিক হল, একদিন অন্তত যাবো।

আমার মেয়ের কাছে পুজো মানে একটা হল ঘর, অনেক লোক। বাহারি পোশাক, নিষ্ঠা সহকারে পুজো, বাঙালীয়ানাকে ধরে রাখার অপ্রাণ চেষ্টায় বিকেলে 'কালচারাল বিচিত্রা অনুষ্ঠান।' আর তারপর আহারের বাহার তো আছেই। ইলিশ থেকে রসগোল্লা, মোচার চপ থেকে ছানার ডালনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পুজোর প্রচারে 'আসুন দাদা দেখে যান আমাদের পুজো' নামক ক্যাম্পেনে বাঙালির ভুরি ভোজ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই বাহ্যিক আড়ম্বরটুকু বাদ দিলে নিষ্ঠা, ভক্তি, আচার পালন, এগুলোর কোনো কমতি নেই। আজ কাল তো পুরোহিতও কলকাতা থেকে নিয়ে আসে বিদেশে। ১০৮ টা পদ্ম ফুল আসে। বাঙালি যে গ্লোবাল তা কি আর নতুন করে বলার? আমার মেয়ের কাছে পুজো মানে নতুন ইন্ডিয়ান ড্রেস পরে সব বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। অঞ্জলির মন্ত্র উচ্চারণ করতে না পারলেও, চোখ বন্ধ করে ঠাকুরের পায়ে ফুল ছুড়ে দেওয়া, শান্তির জল নেওয়ার সময় মাথা নিচু করে ঠাকুর মশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর থালা হাতে খাবারের লাইনে দাঁড়ানো। তাদের পাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাছ পরে না। কারণ তারা মাছের কাঁটা বেছে খেতে পারে না। তারপর খাওয়া শেষে চুপ করে বসে কালচারাল প্রোগ্রাম দেখা। বাবা মার আপ্রাণ চেষ্টা, এই ভাবেই তো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কে চেনানো, জানানো। একটা সন্ধ্যার বাঙালির এই মিলন মেলা থেকে ফিরে এসে আবার সেই দৈনন্দিন, যান্ত্রিক জীবন। বৃষ্টি মুখর দিন, ঠান্ডা হিমেল হাওয়া, পাতা ঝরা, হাইওয়েতে ১০০ কিমি প্রতি ঘন্টায় গাড়ি চুটিয়ে অফিস যাওয়া। পুজোর চারটে দিন এক

সন্ধ্যায় শেষ। আর আমার মতো যারা তারা বাকিদিনগুলো ওই নস্টালিজিয়া নিয়ে কাটিয়ে দেয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে সরব হতে ইচ্ছে করে। পুজো মানে কি শুধুই কালচারাল প্রোগ্রাম? পুজো মানে কি শুধুই খাওয়া দাওয়া? শুধুই সব সময় শুভ অশুভের লড়াই? পুজো মানে সর্বদাই কি নারীর শক্তির উদযাপন? সময়ের আবর্তে পশ্চিম বঙ্গেও পুজো নতুন চেহারা নিয়েছে। উৎসবের আতিশয্যে, অর্থের ভারে , ক্ষমতার ভারে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই সাবেকি পুজো। সাদা ডাকের সাজের এক চালার ঠাকুর, লাল কাপের প্যান্ডেল, কাঠের চেয়ার টেবিল। কলাপাতায় ভোগ। আমার মেয়েবেলার পুজো হারিয়ে গেছে জানি। সংস্কৃতি রক্ষার দায়ভার, সাজপোশাক, বাঙালি হয়ে থাকার প্রবল প্রচেষ্টায় পুজো নিয়ে বড্ডো বাড়াবাড়ি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পুজোকে শুধুই উৎসবের মোড়কে অর্থের জৌলুসে চিনবে জানবে এটা ভেবেই খুব কষ্ট হয়। কিন্তু তবুও একবার ঠাকুর দর্শন, একবার অঞ্জলি, একবার ভোগ খাওয়া, বিদেশে এসে যে এই টুকুই বড়ো পাওয়া। যারা উদ্যোগ নিয়ে এই সব টুকুর আয়োজন করেন তাদের আমার কুর্নিশ।

গত ২ বছর যাবৎ এ দেশে পুজো নিয়ে তেমন হৈহৈ হয়নি। অতিমারীর সময়ে এক রাশ দুঃশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা ময় জীবন। মৃত্যু, শোক, আচ্ছন্ন করে রেখেছিল জীবনকে। আবার শুরু হয়েছে আড়ম্বর। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি অনাড়ম্বরে পুজোর মহিমা কি কোথাও গায়ে খর্ব হয়েছিল আদৌ? সকল জাগতিক আড়ম্বরে দেবী মহিমা কতখানি প্রকাশ পায় জানি না, তবে আমরা যেন ক্রমশ তলিয়ে যাই অন্ধকারে। এই অতিমারী আমাদের এই গতি রুদ্ধ করেছিল। কিছুটা হলেও আমরা নিজেকে জানার বোঝার সুযোগ পেয়েছি। তাই বার বার মনে হয় পুজো জৌলুসের নয়, হোক আরোগ্য কামনার। পুজো হোক মঙ্গল কামনার পুজো। পুজোর মন্ত্র হোক আত্মার শুদ্ধির, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার, অন্তরের কলুষতা বিনাশের। মনের কোণের সেই নিশুম্ভ বিনাশের। এ পুজো হোক অন্তরে, হোক শুভ সময়ের উজ্জাপনের পুজো।

শতরূপা বসু রায়

HCLTech

Supercharging Progress™

পুজোটা হোক

উৎপল চক্রবর্তী

লক্ষ্যটা সব। প্রথাই যদি
এমন হতো?
হোক না পুজো। পুজোটা হোক
পুজোর মতো!

সঙ্গে থাকুক পঞ্চ-প্রদীপ,
বন্ধু বরণ।
চালচুলোহীন দুর্গা মায়ের
নতুন বসন।
আলোয় ভরা মোরাম, খামার,
খেত ও খাদান,
পুজোর লেখা, সাম রাগিণী,
ভোরের আজান।

অন্ধকারের বুকে তুমি
পেরেক পোতো।
হোক না পুজো। পুজোটা হোক
পুজোর মতো!

থিম পুজো নয়, মাটির ঘটে
দুর্গা এঁকে,
শিকাগোতে মঞ্চ সাজুক,
চিহ্ন রেখে।
তন্ত্র সাধক মন্ত্র বলুক
ঢাকের বিটে
আগুন নিভুক দুর্বা জলের
শান্তি ছিটেয়।

বাইরে এসে, কাশের চোখের
জল মোছো তো।
হোক না পুজো। পুজোটা হোক
পুজোর মতো!

তোমার আমার দুর্গামাকে
ধ্যানীর বেশে
চলো সবাই মিলিয়ে দিই
এক নিমেষে।
উৎসবেরা চাপা থাকুক
ভিতর ঘরে
নেয়ে উঠি প্রেমের নতুন
কলেবরে।

বিশ্বজুড়ে শুশ্রূষা পাক দুঃখ, ক্ষত।

হোক না পুজো। পুজোটা হোক
পুজোর মতো।

খোলা কোনও মাঠের পরে,
স্মৃতির বাঁকে,
মাথা ঠুকে, প্রণাম কোরো
দুর্গা মাকে।
ভগ্নি, মাতা, কন্যা, তিনি
এলোকেশী।
সতী তিনি, বরদায়িনী,
প্রতিবেশী।

পুজো দিলে, পুজো পাবে
তুমিও তো।
হোক না পুজো। পুজোটা হোক
পুজোর মতো।

দূর্গা পুজোয় কলকাতায় কদিন

অর্চনা পাল

পানিহাটির কুখ্যাত ভাঙাচোরা রাস্তায় যেখানে নেই সবুজের বিন্দুমাত্র নিদর্শন, উল্টে পুরো রাস্তা ময়লা ফেলার ডাস্টবিন মনে করে আছে যত্রতত্র ইচ্ছে মতো তৈরি ময়লার ছোটখাটো পাহাড় ও তার থেকে দুর্গন্ধ বয়ে চলা পরিবেশ, এহেন সেই পাড়ার কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতো পাড়ার ক্লাব 'সবুজ সংঘ'। এই পুজোর ক্লাবটি পাড়ার রাস্তায় এক মাথায় অবস্থিত আর অন্য মাথায় রয়েছে বছর ষাট অতিক্রান্ত কাচা পাকা চুল দাড়ির অধিকারী সব বালকদের ক্লাব অর্থাৎ 'বালক সংঘের' সংঘর্ষ পূর্ণ পুজোর হিড়িক। এরই ঠিক মধ্যিখানে অবস্থিত আমাদের ছোট দুই কামরার আবাসনের বাসা। আরও একটা মজা হলো এই দুই ক্লাবের মধ্যিখানে চেপটে থেকেও পুজোর সংঘর্ষ আরো জোরদার করতে 'হাম ভী কুচ কম নেহি' মনোভাবের আবাসনের আবাসিকরা কোমর বেঁধে নিজেরাই পুজো করে থাকেন।

আসলে এত ভূমিকার কারণ পুজোর কটা দিন সকাল থেকে পরিবেশটা ঠিক কিরকম সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি মাত্র। ঘুম ভাঙে প্রাথমিক ভাবে সবুজ সংঘের ঢাকের আওয়াজে। যদিও ভোরের আলোটুকু ওঠার অপেক্ষা করে ওরা তবে শব্দের উচ্চতায় মনে হয় কুম্ভকর্ণের মতো আমার ছমাস ব্যাপী ঘুম ভাঙানোর জন্য কানের পাশেই বাদ্যির আয়োজন করা হয়েছে। তবে মূহুর্তেই সে আওয়াজ উপচে মিনিট খানেকের মধ্যেই বালক সংঘ তারস্বরে পুজোর মন্ত্র পাঠ শুরু করে দেয়। কি ভয়ংকর সে ভক্তি প্রদর্শন! দরজা জানলা ভেদ করে সে মন্ত্র হৃদযন্ত্রের গতি বাড়িয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ। বিছানা আঁকড়ে আর শুয়ে থাকে কার সাধ্যি? এমন সময় হঠাৎই কান ফাটানো শব্দে তড়িঘড়ি বিছানা থেকে বিতারিত হই আমি। 'বাজল তোমার আলোর বেণু' আবাসনই বা পিছিয়ে থাকে কেন? তবে বাজলো বলে বাজলো? তিন তিনটে মাইক, এদিক ওদিক লাগানো খানেক দশেক চোং এমন জোর বাজলো যে পাড়ার সকল বাসিন্দার একসাথে জম্পেশ জাগরণ হলো। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে মুখোমুখি রাস্তার উল্টো দিকে জানলায় দাঁড়িয়ে পুঁচকে ছেলেটার সে কি কান্না! আহা, একটু যে ওর সঙ্গে কথা

বলবো, সান্তনা দেবো কার সাধ্য? নিজেকেই বদ্ধ কালা মনে হচ্ছে!

বেলা দশটা বাজতে না বাজতেই রোল রিভারসাল। তখন সত্যি করে ঠিক বলতে পারব না কোথা থেকে কোন আওয়াজটা আসছে। কখনো কিশোরকুমার, কখনো কুমার শানু, কখনো পল্লীগীতি তার সাথে ঢাক, তার সাথে বিভিন্ন কোম্পানির প্রচার সাথে করোনা থেকে বেঁচে থাকার উপায় বাতলাতে থাকেন সুকণ্ঠী বাচিক শিল্পীরা আর সঙ্গতে অবশ্যই ননস্টপ বাইক, রিক্সা, টটো ও অটোর হর্ণ। এদিকে দুপুরের পর বিকেল থেকে শুনছি এক ক্লাবে হবে নাটক আর এক ক্লাবে হবে কুইজ প্রতিযোগিতা। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল যাই, কিন্তু কোনটাতে যে যাবো বুঝতে পারছিলাম না কারণ দুটোই বড় প্রিয় ও পছন্দের। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যে হতেই কানের পোকা বের করে নেওয়া মাইকে নাটকের সংলাপ বলে বলে দর্শক জমায়েত করার কৌশলে মোটামুটি বুঝে গেলাম নাটকের সারাংশ।

নাটকের নামটা বেশ জম্পেশ, 'অমৃত অনলাইন'! কিন্তু ডায়লগ শুনে বুঝলাম সেই থর-বরি-খাড়া গল্পের নাটক। দূর আর দেখার ইচ্ছা রইল না। খানিক পরে নাটকের সাথে ওপাশে কুইজ প্রতিযোগিতাও শুরু হয়ে গেল। কুইজের প্রশ্ন শুনে চোখ কপালে উঠল! হয়েছে কি প্রশ্নটা হয়তো করা হয়েছে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের সবচেয়ে আগে সূর্যোদয় হয়, কিন্তু কানে আসছে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের সবচেয়ে আগে বলে তারা রারা তারা রারা!! বর্তমানে সমুদ্র মন্থনের মন্ত্রীর নাম কি!! কি দিয়ে মাপা হয় মমো চিত্তে নৃতে নৃত্যে ভূমিকম্প!!

কুইজের নিকুচি করেছে! দরজাটা বন্ধ করে এসে ঘরে ঢুকতেই কানে আসছে আবাসনের মাইকে বাজতে থাকা পাল তুলে দে আমি যাবো মদিনা। রাগে মাথাটা আরো গরম হয়ে গেল। আমি যাবো কলকাতার ঠাকুর দেখতে তাই হয়ে উঠেছে তা না আবার মদিনা যাচ্ছে! ওদিকে তো বেজেই চলেছে তুই হেলা করিস না, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা! উফ্ উফ্ উফ্ আর নেওয়া যাচ্ছে না! কানটা একটা বালিশ চাপা দিতেই হঠাৎ দেখি উরিব্বাস সে কিই চিৎকার! আমি গয়া গেলাম কাশীগো গেলাম... বুঝলাম মদিনা ঘোরা হয়ে গেছে এবার গয়াকাশী!! নাহএভাবে ঘরে বসে আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘোরা যাবে না, তারচেয়ে বরং ঝটপট রেডি হয়ে পাড়ার কটা ঠাকুর দেখেই আসি।

যা হোক সেদিন নিতান্তই পারিবারিক জটিলতার কারণে খুব বেশি ঘোরাঘুরি হলো না। নতুন শাড়ি গায়ে চাপিয়ে আর নতুন জুতো পায়ে গলিয়ে রাস্তার সব জলজমা গর্ত টপকে টপকে, ময়লার পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে ওই সবুজ বালকদের ঠাকুর দেখে ঘরে ফিরবো ভাবলাম। কুমির-ডাঙা খেলার মতো খুব সন্তর্পণে হাঁটাচলার করে ছিটকে আসা কাদাজল থেকে পরনের শাড়িটাকে বাঁচাতে পেরে মন খুশি হয়ে গেল। যা গুমোট গরম, না বেশি ঘোরাঘুরি করা যাবে না। প্যান্ডেলের পাশে ধুঁয়ো ওঠা ফাস্ট ফুডের স্টলের থেকে খুব এগরোল খেতে ইচ্ছে হলো। কিনেও নিলাম একখানা। গরম গরম এগরোল গলাধঃকরণ করে বাড়ির দিকের রাস্তায় নেমে পড়লাম। অটো, টটো, বাইক, সাইকেল, গাড়ির সাথে আবার কুমির-ডাঙা খেলতে খেলতে বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

মোটামুটি রাত এগারোটার পর পাড়াটা অমাইক হয়ে উঠল। মোবাইল ঘাটতে ঘাটতে সারাদিনের ক্লান্ত চোখের দুটো পাতা সবে মাত্র চুম্বকের টান অনুভব করছে এমন সময় হঠাৎ ঘুমের বিঘ্ন ঘটল ভীষণ রকমের। পাড়ার দুই মাথার দুই ক্লাবের দায়িত্বে থাকা চারপেয়েরা এতক্ষণে তাদের কর্ণসাটের চান্স পেয়েছে! কি কি সব গায়কি! চোখের পাতা কেন গাছের পাতাও যে গাছে থাকতে পারছে না আর আমি হলফ করে বলতে পারি। শুধু ঘেউ ঘেউই যে এত রকম সুরে, স্কেলে, লয়ে হতে পারে বহুদিনের না শোনার অনভ্যাসে ভুলেই গেছিলাম। তবে বেচারাদের দোষ দি কি করে। সারাদিনে গলা সাধার সুযোগ বড় বেশি নেই এই পুজোর কটা দিন। তা বলে কি পাড়ার বাসিন্দাদের ওরা ওদের কর্ণসাট থেকে বঞ্চিত করবে? কক্ষণো তা নয়! তিড়িং করে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গেলাম ওদের ব্যাপার স্যাপার চর্মচক্ষে দেখতে।

দেখলাম এক বাড়ির ব্যালকনি থেকে মগে করে জল ছিটিয়ে ওদের জমায়েত ভঙ্গ করার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভাবলাম অবলা প্রাণী বলে তাই না, দাও না দেখি এমন জল ছিটিয়ে ওই দশ দশটা চোংয়ের উপর, কেমন পারো! বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে পড়লাম। বিছানায় শুয়ে চোখের পাতা দুটোকে এবার জোর করেই এক করবার চেষ্টা করলাম। বাইরে তাদের সাধনা তখনও চলছে কম বেশি। আস্তে আস্তে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম আর নিমেষেই স্বপ্ন জগতে পদার্পণ করলাম। স্বপ্নের একটা দারুণ মজার ব্যাপার হলো বেশিরভাগ সময়ই নানাবিধ অদ্ভুত ছায়াছবিতে নিজের অভিনয় নিজেই দেখতে পেয়ে থাকি।

এবারেও পরিষ্কার দেখতে পেলাম হল্যান্ডের উয়িন্ডমিলের আদলে মন্ডপ সজ্জা। পুজোর আগে সাতদিনের নিম্নচাপের কারণে মন্ডপের পাশে প্রাকৃতিক ক্যানেল তৈরি হয়েছে। অথচ ঝকঝকে পরিষ্কার চারিদিক, নো কাঁদা প্যাচপ্যাচ। ঠাকুরের মূর্তিতেও চমকের শেষ নেই! দুগ্গামা ছেলে মেয়ে নিয়ে রীতিমত জ্যাকেট সোয়েটার চাপিয়ে মন্ডপে হাজির। মহাষ্টমীর অঞ্জলী দেবো বলে আমি হাত জোর করে মন্ত্র বলা শুরু করতেই হঠাৎই একটা বিকট আওয়াজ! কিসের

কি হলো? তবে কি কেউকনহফ বাগানের সব ফুল একসাথে ফুটে উঠল! ওদিকে বেশ অনুভব করলাম এত ঠান্ডাতেও কেমন জানি ভেজা ভেজা ঠেকছে সব কিছু। তড়িঘড়ি উঠে বসলাম। হলো কি? এ্যাঁ! ও বাবা, এ যে ঘামে সর্বস্ব ভিজে গেছে দেখছি! লোডসেডিং মন হচ্ছে! ফ্যানটা দেখি গো-স্ট্যাচু খেলার মতো ঘুরতে ঘুরতে চুপটি করে তিন হাত মেলে পোজ দিয়ে ক্ষান্ত হয়ে ঝুলে রয়েছে। বাইরে কি অসীম শান্তি বিরাজমান! আলো নেই, আওয়াজ নেই শুধু অন্ধকারের সাথে সহাবস্থান! এহেন ঘুটঘুটে রাতে মোবাইল হাতরে দেখলাম সবে রাত ১১৭! কি প্রচন্ড গুমোট গরম। কি করে যে বাকি রাত কাটবে?

বারান্দায় বেরিয়ে এলাম আবার। ওমা! দেখি আমারই উঠতে সবচেয়ে লেট! পুরো পাড়া তখন রাস্তায় আর বাড়ির বারান্দায় বা জানলায়। জানতে পারলাম এত অধিক মাত্রায় আলোকসজ্জা ও নানা বিধো কারণে অত্যাধিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য এই পাড়ার ট্রান্সফরমারটি দেহ রেখেছেন স্বশব্দে। বুঝলাম স্বপ্নের মধ্যে অজ্জিনাল যোগাযোগ এটাই ছিল তারমানে। ভীষণ রকম গুমোট গরমে তেল চপচপে এগরোলের আফটার এফেক্ট মজ্জায় মজ্জায় টের পাচ্ছি এখন। বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলাম। প্রাণটা যায় যায় অবস্থা প্রায় যখন খবর পেলাম সানীয় বিদ্যুৎ অফিস থেকে গাড়ি এসেছে। সারারাত কাজ হবে আজ। শুনে যেন মনটা ঠান্ডা হলো একটু।

এরপর দীর্ঘক্ষণ পায়চারীর পর ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় সমর্পণ করলাম। ঘড়িতে তখন ভোর চারটে বাজে প্রায়। খবরের কাগজের হাওয়া খেতে খেতে চোখ লেগে গেছিল কখন। বেলা আটটা বাজিয়ে ঘুম ভাঙল আজ। দেখলাম কারেন্ট তখনও আসেনি। তবে মেঘলা হওয়াতে গরম, রাতের তুলনায় কম লাগছে। জানলা দিয়ে হালকা ফুরফুরে হাওয়াও আসছে মাঝে মধ্যে। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। এক প্যান্ডেল থেকে মাইক বিহীন ঢাকের আওয়াজ আসছে। আহা সকাল সকাল মনটা ভালো হয়ে গেল। বারান্দা থেকে রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা পুরোটা দেখা যায়। এসে দাঁড়ালাম। হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আজ যেন পাড়ার সবার লেট জাগরণ! একেই রাত করে শোয়া তার উপর মাইকের দায়িত্ববান নাগরিকের মতো ঘুম ভাঙানোর পালা নেই। নাহ যাই বরং, চান পর্ব সমাপ্ত করে আবাসনের পুজোর জোগাড়ে যাই। আজ যে সহাসপ্তমী!

অণু-চার

ফায়েজ আহমেদ ফায়েজ

অণুগল্প ১

সুখ

চলতে শুরু করলাম সুখের উদ্দেশ্যে। শুনেছি সে অনেক দূরের রাস্তা, সেখানে সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি হাতে হাত ধরে বসে আছে আমারি অপেক্ষায়। সেখানে যাওয়ার জন্য নাকি চলতে হয় ভোরবেলা উঠে। নাহলে যেতে যেতে পথে দেরি হয়ে যায়, রাত নেমে আসে।

পা চালাতে লাগলাম দ্রুত। ভোরে উঠে সব ছেড়ে বেরিয়েছি সেখানে যাবো বলে।

দুপাশে আমার চেনা জানা পরিবেশ, যা কিছু এখনো আমার, দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছি।

ওই তো, ওই তো আমার চেনা খেলার মাঠ, কজন সেখানে এখনো খেলছে, ওদের সবাইকে আমি চিনি। কেউ কেউ বোধয় হাত তুলে আমাকে ডাকলো, দেখার সময় নেই। আমি হাঁটছি মহত্তর উদ্দেশ্যে।

দেখি, পথের ধারে একটা রেইন লিলি ফুটেছে, দেখতে ইচ্ছা করলো খুব। এক পলক দাঁড়িয়ে দেখতে গেলাম, অন্তরাত্মা গম্ভীর স্বরে মনে করালো, আমার যাত্রা দূরের।

কত চেনা লোকজন, আমার দুপাশে। কিন্তু হাঁটার দ্রুততায় তাদের মুখগুলো ঝাপসা, ঠিক করে কাউকে চিনতে পারছি না। একটু দাঁড়ালেই চিনতে পারতাম কিন্তু সময় নেই যে। তারা কিছু বলছে? দাঁড়িয়ে শোনার জো নেই, দেরি হয়ে যাবে আমার।

আস্তে আস্তে পেরিয়ে যাচ্ছি গ্রামের সীমানা। এতক্ষন মা এসেছিল পিছন পিছন, যথা সম্ভব তাল মিলিয়ে, সাবধানে যাস বাবা বলতে বলতে। বাবাও এসেছিলো হয়তো, নিশ্চুপ ছিল। আমি তো আর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পারি না, পেছনে ফিরে দেখা নিয়ম নয় এই যাত্রার। তাই জানি না। ক্ষীণ হতে হতে আর মায়ের গলাটাও শোনা যাচ্ছে না। ভাইবোনকে তো সেই বাড়িতেই ছেড়ে এসেছি বোধয়। যখন পৌঁছে যাবো অভীষ্টে, ফিরে এসে নিয়ে যাবো এদের, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি।

গ্রাম পেরিয়ে এখন আমি নতুন নগরে। এখানে সবাই নতুন, নতুন পথঘাট, নতুন মানুষ, নতুন চলার নিয়ম। যথা সম্ভব মানিয়ে নিয়ে চলতে থাকি। তারা কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। আমি কি মিস করছি আমার নিজের এলাকা? কেউ তো সেখানে কিছু বলতো, আমি বুঝতে না পারলেও।

দেখি, সুখ গাড়ি পাঠিয়েছে। আরো দ্রুত যেতে পারি যাতে। উঠে চালাতে লাগলাম উন্মাদ গতিতে, হেঁটে আসতে সময় লেগেছে অনেক। সেটা আমাকে পূরণ করতেই হবে, রাত হবার আগে পৌঁছে যেতেই হবে আমার লক্ষ্যে। কেউ চাপা পড়লো, কাউকে ধাক্কা মারলাম? Why don't I care? I know I should. সমস্ত নিয়ম ভেঙে চালাতে থাকি আমি। মাসুল দিয়ে দেব, পৌঁছে যাবার পর।

ধীরে ধীরে সে নগরও পেরিয়ে যাই। এখন বিকেল। আর কিছু নেই আমার চারিপাশে। শূন্যতাও নেই। অনেক দূরে ঝিলিক দেয় কিছু, খুব আবছা একটা সিলুট দেখতে পাই। আনন্দে আত্মহারা হই আমি। ঐতো, ওইখানে আমার যাত্রা শেষ, ঐখানে আমি দুদণ্ড শান্তির নিঃস্বাস নিতে পারবো, ওখানে আমার সব ক্লান্তির উপশম লুকিয়ে আছে।

দুর্দম বেগে চালাই গাড়ি। কিন্তু দূরত্ব কমে না কেন? গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে এক্সেলারেটর চেপে ধরি গাড়ির ফ্লোরে।

এখন রাত। পৌঁছাইনি আমি সেই গন্তব্যে, আমার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। পথের ধারে তেল শেষ হয়ে যাওয়া বন্ধ গাড়ির মধ্যে একা বসে আছি আমি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিজেকেও দেখতে পাই না। কিন্তু আর ফিরে যেতেও পারবো না, গতির নেশায় খেয়াল করিনি আমার যাত্রাপথ। এই প্রথম আমার বড় একা লাগে। এই প্রথম আমার কান্না পায়।

অণুগল্প ২

সুপারহিরো

—বেতাল কি বললো রে?

—তার কোমরে নাকি ফিক ব্যথাটা চেগে উঠেছে, ডাক্তার কমপ্লিট বেডরেস্ট বলেছে।

—আবার? এই বুড়ো বয়সে কাজটা ছেলের হাতে

ছাড়ছে না কেন কে জানে। বুদ্ধিশুদ্ধি সব হাঁটুতে এদের। ম্যানড্রেক?

—কোথায় সে? সে পুরো ট্রুপ নিয়ে য়ুরোপ টুরে গেছে। ম্যাজিক শো আছে তার নাকি গোটা য়ুরোপে। তার সেক্রেটারি বললে।

—বাহ এই না হলে হিরো অব দ্য নেশন! এই সময়েই তাকে যেতে হলো? অবশ্য বিদেশী তো, ওদের আর আমাদের বাংলার প্রতি কি টান থাকবে। আশা করাও ভুল। বাহাদুর কি বললে?

—সে আবার বাংলা বোঝে না। অনেক কষ্টে তাকে বললুম। সে পাত্তাই দিলে না। বললে, ওসব জায়গার কালচার আমি বুঝি না। কিছু না বুঝে মাথা গলিয়ে লাভ নেই।

—ওসব জায়গা মানে? বাংলা কি দেশের বাইরে নাকি? এরা এখনো আমাদের চিনবে না?

—কি বলি বলো বাবা।

—বেশ। সত্যিই কিছু বলার নেই। ওদিকে গেলি যখন, চৌধুরীর সাথে দেখা করলি?

—কে চৌধুরী?

—অরে চাচা চৌধুরী।

—ওহ। পুরোটা বলবে তো।

—আরে সে কি আমার চাচা নাকি যে তাকে আমি চাচা চৌধুরী বলবো? বুদ্ধিশুদ্ধি তোর হবে না। গিয়েছিলিস কি? সেইটে বল।

—যাইনি আবার? গেলুম তো।

—তো কি বললে?

—বললে, দেখো বাবা, যারা একটা মন্দিরের সামনে হাড় ফেলা নিয়ে তুলকালাম করে দাঙ্গা লাগিয়ে ফেলতে পারে, তাতে বারো জন মরে যেতে পারে, তারা সত্যি বুদ্ধিহীন প্রাণী।

—মানে, ওনার কম্পিউটারের থেকেও প্রখর দিমাগ এখানে উনি লাগাবেন না, তাই তো?

—ঠারেঠোরে তো তাই বললেন। সাবুও দেখলুম ঘাড় নাড়লে।

—এদের দিয়ে সত্যি হবে না। ভাবছি বিকেলে ফেলুর কাছে যাব একবার।

—ফোন করেছিলুম।

—আমাকে না বলে ফোন করে ফেললি? কদ্দিন কথা হয়নি। সে যা ব্যস্ত।

—কি নিয়ে ব্যস্ত সেটা শুধু জানি না। আমাকে বললে, দেখো, এখানে মগজের কাজ কই। এ তো বুনো ষাঁড়ের লড়াই। এখানে আমি নিরুপায়। একটা দুটো খুন হলে, সোনাদানা ইনভলড থাকলে আমি কিছু করতে পারতাম।

—এই বললে ফেলু! হ্যাঁ রে, তাহলে আর বাকি কে রইলো? আমার তো মাথায় কিছু কাজ করছে না।

—করছে না?

—না। তুই বল। তোর মাথায় কেউ আছে নাকি?

—আছে তো। তুমি আছো। আমি আছি।

অণুগল্প ৩

কবিতার বই

কবি যেদিন বিজ্ঞাপন দিল
'আমার সমস্ত পুস্তক বিক্রয় করিতে চাই',
সেদিন অনেকেই হামলাইয়া পড়িল।

কবির পরশপ্রাপ্ত পুস্তক ওজনদরে কিনিয়া
চমৎকার ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন করা যায়।

সেদিন কবির আঙিনায়, শুধুই ধনবানদের ভিড়।
সেই প্রথমবার।

কবির বই, একটি একটি করিয়া বই তুলিয়া, চাখিয়া, চাটিয়া, শুঁকিয়া কিনিয়া লইবার এ সুযোগ প্রত্যহ আসে না।

কিন্তু সে আঙিনায় বই কৈ! কবি একা দাঁড়াইয়া

কেহ খুঁজিলো তাহার প্রেমের কবিতার সংকলনটি
কবি নিজ বক্ষস্থলের উপর হাত রাখিয়া কহিল, এই তো।
হৃদয়খানি কাটিয়া বাহির করিয়া, নিখুঁত তুলায় মাপিয়া দিল তাহাকে।

যে চাহিলো সমাজের প্রতিবিম্বস্বরূপ তাহার লেখাগুলি
তাহাকে নিজের দুই চক্ষু উপড়াইয়া দিয়া দিল।

হঠাৎ কেহ চাহিলো তাহার আত্মসমালোচনার কবিতাগুলি
সে নিজ করোটির অন্দর হইতে বাহির করিয়া দিল নিজ মস্তিস্কটুকু

কেহ চাহিয়া লইলো তাহার শাব্দিক মাধুর্য্যের ভান্ডার
সে নিঃশব্দে নিজ হস্তটি কাটিয়া বিক্রয় করিল তাহাকে।

অতঃপর
দিবসান্তে কেহ যখন জিজ্ঞাসা করিলো, সে কবি কৈ ?
একটি বিকৃত কংকাল দেখাইয়া পাশের জন মন্তব্য করিল,
লিখতো ভালো কিন্তু।

Conceptualised, Managed and Marketed by:

AmbujaNeotia

A BETTER LIFE IS CALLING YOU HOME

2 BHK ₹29 LACS*
3 BHK ₹36 LACS*
ONWARDS

*TAXES AND OTHER CHARGES EXTRA
1% GST

USSHAR
THE CONDOVILLE

Welcome to Usshar ~ The Condoville. Close to the rippling waters of the Ganges, amidst lush greenery. In a serene and well-connected neighbourhood, an aesthetically designed development packed with modern-day amenities. A safe and secure abode, specially designed to make your kids joyful and the elderly feel cared for. Where a happy, healthy and active life is celebrated with panache

Usshar — where nature creates the music of life, and Ambuja Neotia creates the melody of happy living. Together, we gift you a symphony called home!

• G+31 • 12 Towers • Located in Maheshtala in Batanagar • 3 to 4 sides open biophilic apartments • Overlooking 30-acre greenery • Breathtaking Ganga view from top floors • Panoramic city skyline • Exclusive Residents' Club

Senior Citizen's Zone

Kids' Play Area

Infinity Swimming Pool

Hangout Zone

ALL IMAGES ARE ARTIST'S IMPRESSION

Hangout Zone with Pergolas | Jogging Track | Open-Air Amphitheatre | Golf Course Viewing Deck | Infinity Swimming Pool Gymnasium | Multipurpose Hall | Half Basketball Court and Much More

HIRA/P/SOU/2020/001067 | www.hira.wb.gov.in

Call 4040 8085

SAVOUR THE JOY OF CONNECTED LIVING

URVISHA
THE CONDOVILLE
NEW TOWN

All images are Artist's Impressions

GYM

Kids' Play Area

Infinity Swimming Pool

Terrace View

A PRIME LANDMARK ADDRESS

Welcome to Urvisha-The Condoville, your urban oasis in an unmatched address. Right in the business district of New Town. Where your life is equally enticing, be it the indoors or the outdoors. Built on the foundation of Ambuja Neotia's trust and promise, it is a cradle crafted for the happy life you deserve – right in the city, in nature's company.

APARTMENT TYPES AND PRICES

UNIT DETAILS

Description	Standard Built-up Area	Apartment Carpet Area	Balcony Carpet Area	Utility Carpet Area	Price (₹)
2 BHK	1184 - 1255 sq ft	735 - 776 sq ft	89 - 97 sq ft	22 - 27 sq ft	1.27 Cr* onwards
3 BHK	1576 - 1681 sq ft	1028 - 1091 sq ft	87- 103 sq ft	24 - 28 sq ft	1.68 Cr* onwards

AmbujaNeotia

4040 8080

Project approved by

SBI ICICI Bank Home Loans khayaal aapka HDFC HOME LOANS apni jagah banao AXIS BANK HOME LOANS and other leading banks

Site address : Plot AF-II, Premises No -04 - 0030, New Town, Action Area - I Kolkata, West Bengal, India 700156.

A Project of Bengal Ambuja Housing Development Limited (A JV Company of West Bengal Housing Board & Ambuja Neotia Group) | HIRA/P/NOR/2020/001066 | www.hira.wb.gov.in

Disclaimer: Information, images and visuals displayed in this advertisement are artist's impressions and only indicative of the proposed development. The terms and conditions of sale and usage of services depicted here shall be subject to the agreement entered between the Promoter and the Allottee. Since in the State of West Bengal, no authority has been formed as yet under the Real Estate (Regulation and Development) Act 2016 (RERA), the project is not registered under RERA. The project however is fully compliant with provisions of RERA, 2016 and the Rules framed thereunder in the state of West Bengal. Registration will be applied for as soon as the applications are accepted by the authority once constituted.

প্রিয়তমেষু,
তোমাকে চুমু খেতে বলিনি।
ভুল করলে ক্ষমা চাইতেও বলি না।
খুব মন খারাপ করলেও, ডাকবো না,
বলবো না, এসো, জড়িয়ে ধরো আমায়,
মিথ্যে করেও বলতে বলিনি,
বলো, আমায় কত ভাল দেখাচ্ছে।
আমায় একটা সুন্দর চিঠি লিখবে? বলিনি কখনো।
ফোন করে আমায় বলো, সারাদিন কি করলে,
কেমন কাটলো সব, না, তাও বলি না।
সারাদিনে কি একবারও আমার কথা ভেবেছিলে, তাও জিজ্ঞেস করিনি
এই যে দিনভর তোমার জন্য আমি এত কিছু করি
তার জন্যে ধন্যবাদও চাইনি।
মন খারাপ করেছে, পাশে থাকো আমার
এ আবদারও করিনি।
যখন কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নেই
তুমি সমর্থন দেবে, সে প্রত্যাশাও রাখি না।
জেগে থাকা রাতে, অর্থহীন হাজার গল্প করতে ইচ্ছে করে
তোমাকে সেসব শুনতে হবে, সে দিব্যি দেইনি।

কিছুই চাইনি আমি তোমার কাছে প্রিয়
এমনকি সারাজীবন আমার পাশে থাকো
এটিও না।

চেয়ে নেয়ার মধ্যে কি আর আনন্দ থাকে সোনা।

স্বামী ডিয়েগো'র সাথে ফ্রিদা কাহলো'র আলাপচারিতা অবলম্বনে

তানবীরা হোসেন

‘যতদিন বাঁচবো অভিনয় করে যাবো।’

একটা হাস্যোচ্ছল উদার প্রকৃতির মানুষ তিনি। মজা করতে ভালোবাসেন। জীবনের সকল ওঠানামায় অদম্য মানষিক শক্তি। কোন পরিস্থিতিতেই পিছু হাঁটেন না তিনি। ’জয় গোপাল’ বলে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিপদে, নিয়ে নেন বড় ঝুঁকি। একটু আন্দাজ করতে পারছেন কি কার কথা বলছি? এনাকে আপনারা রোজ দেখেন টিভির পর্দায়। রাত ৮টায়। ঠিক ধরেছেন। ইনি হলেন মিঠাই সিরিয়ালের দাদাই। তবে ওটা তো নেহাৎই একটা কাল্পনিক চরিত্র। প্রাণ সুধায় টেটুম্বু যে মানুষটির কথা বলছি তিনি কাল্পনিক চরিত্র নন. তিনি বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। মানুষটাকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা হয়তো জানবেন যে কোথাও গিয়ে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী এবং সিদ্ধেশ্বর মোদক যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সকলকে আপন করে নেওয়া, প্রাণখোলা হাসি, অমায়িক, অসম্ভব ধারালো একটা রসবোধ, তিনি বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বলেই বোধয় সিদ্ধেশ্বর মোদক আজ বাংলার প্রতিটি ঘরে দাদাই রূপে বাস করেন।

শতরূপা বোস রায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে সিদ্ধেশ্বর মোদক ওরফে **বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী** বললেন তার অভিনয় জীবনের একটা বিশাল পরিধির কথা। ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘দোসর’ এবং ‘অন্তরমহল’ ছবির পর ‘মিঠাই’ সিরিয়ালের ‘দাদাই’ এর চরিত্রে অভিনয় করতে করতেও তিনি কি ভাবে অনুপ্রাণিত হন।

● অভিনয় জীবন শুরু হয় কি ভাবে ?

●● পেশাগত ভাবে অভিনয় করবো কোনোদিন ভাবিনি। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন। বাড়িতে নাটকের চল ছিল। দাদা নাটক করতেন। তখন একটু আধটু নাটক করতাম। এবং সেই থেকেই নাটকের প্রতি একটা ভালো লাগা জন্মে গেছিলো। আমার বাবা মারা যান মাত্র ৫৩ বছর বয়েসে হঠাৎ। আমি তখন কলেজে পড়ি। স্বাভাবিকভাবে সংসারের দায় এসে পরে ঘাড়ে। কলেজ পাশ করেই “ল” পরীক্ষা দিয়ে কাকার সঙ্গে ট্যাক্স কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ শুরু করে দি। ৪০ বছর অবধি ট্যাক্স কনসালট্যান্ট ছিলাম। সেই সূত্রে একটা চেনা পরিচিতি হয়, কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে মেম্বার হই। আইনজীবী হিসেবে পরিচিতি হবার ফলে তখন ক্লাবের নাটক আবার শুরু করেছি। একদিন ক্যালকাটা

ক্লাবে অশোক বিশ্বনাথন আমাদের নাটক দেখতে এলেন। উনি তখন ওনার ছবির জন্য লোক খুঁজছেন। ওনার প্রথম ছবি 'শূন্য থেকে শুরু'। আমায় এসে বললেন, 'আপনি তো বেশ ভালো অভিনয় করেন, আমার ছবিতে অভিনয় করবেন?' আজ ভাবলে অবাক লাগে, আমারও কিন্তু সেই শূন্য থেকে শুরু।

তারপর আর কোনোদিন আমায় পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক ডাক এসেছে। সুযোগের অভাব হয়নি।

● আইনজীবী না অভিনেতা? কোন পরিচয়টা বেশি কাছের বলে মনে হয়?

●● অভিনেতা! কারণ আমার চিরকালই অভিনয় করতে ভালো লাগে। তাই সেটাই বেছে নিয়েছি। কিন্তু আমি আমার প্রফেশন ছেড়ে দি নি কোনোদিন। আমার অফিসে আমার জুনিয়ররা এখনও কাজ করে। সেটি যেমন চলছিল

তেমন চলছে। অবশ্যই আমি খুব একটা সময় দিতে পারিনা।

● ছোট পর্দা বেশি আকৃষ্ট করে না বড় পর্দা?

●● আমাদের মতো অভিনেতাকে ঘিরে তো কোনো স্টারডম নেই, আমরা তো ক্যারেক্টার একটার! তাই আমাদের এই অসুবিধাটা নেই যে সিনেমা করলে টিভি করতে পারবো না। আমি যেমন ঋতুপর্ণ ঘোষের তিনটে ছবিতে অভিনয় করেছি তেমনি ওর "গানের ওপারে" নামক টিভি সিরিয়ালেও অভিনয় করেছি। তবে আমার অভিনয় করতে ভালো লাগে। ছোট পর্দা না বড় পর্দা এরকম কিছু ভাবিনা। একটা একটা চরিত্র ফুটে ওঠে লেখকের কলমে, অভিনেতা হিসেবে আমি সেই চরিত্রে প্রাণ ঢেলে দি. আগে অবশ্য সিনেমা করার সময় অনেক পেতাম। এখন মিঠাই এর জন্য মাসে ২০ দিন টানা শুটিং থাকে, সুতরাং অন্য কাজের জন্য সময়াভাব দেখা দেয় তখন।

● কমার্শিয়াল ছবিও তো

আপনি অনেক করেছেন?

●● হ্যাঁ তা করেছি। একটা সময় যখন বয়েস কম ছিল ওই কাজগুলোকে বাজে কাজের তালিকা ভুক্ত করেছিলাম। সত্যি বাজে কাজ সেগুলো। হয়তো দর্শকও বলবেন যে সেই একই কথা। কিন্তু পরে সৌমিত্র বাবুর সঙ্গে একবার একটা আলোচনায় ওনার একটা কথা আমার মনে ধরেছিল। উনি বলেছিলেন কাজের ভালো মন্দ হয়না। কে বলেছিলো ওনাকে? স্বয়ং সত্যজিৎ রায়. সৌমিত্র দা, যাকে আমি আমার গুরু বলে মানি, তিনিই বলেছিলেন গল্পটা।

সময়টা "অপুর সংসার" করার পর পর। একদিন সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে গিয়ে সৌমিত্র বাবু বললেন, আমার একটা ছবি দেখতে নিয়ে যেতে চাই আপনাকে। জানি এ ছবি আপনার পছন্দ হবে না। কমার্শিয়াল একটা ছবি। একেবারেই বাজে একটা কাজ। কিন্তু আমি চাই আপনি একবার দেখুন ছবিটা। সত্যজিৎ রায় রাজি হলেন। বললেন সৌমিত্র বাবুকে তিনি যাবেন।

আমাদের অভিনয়ের জগতে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এর একটা টেকনিকাল ভাষা আছে। সেটি হল, 'সাজেশন প্রেফারেন্স'. যার দিকে ক্যামেরার ফোকাস সে হলো 'প্রেফারেন্স' আর যে ক্যামেরার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে প্রেফারেন্সের সঙ্গে কথা বলছে সে হলো 'সাজেশান'।

একটি শটে সৌমিত্র বাবু সাজেশান এঙ্গেলে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই শটটি দেখে সত্যজিৎ রায় সৌমিত্রবাবু কে বলেছিলেন তুমি অমনোযোগী ছিলে সাজেশানে। সৌমিত্র বাবু অবাক হয়ে বলেছিলেন, এতো বাজে একটা ছবি, এতো বাজে কাস্ট, আমার মন ছিল না সেটে। সত্যজিৎ রায় গম্ভীর গলায় সৌমিত্রবাবুকে বলেছিলেন, "কাজ যখন নিয়েছিলে, তখন এরকম কথা বলার কোনো মানেই হয়না। যেটা করছো সেটা সততার সঙ্গে করতে হবে। তুমি রাজি যখন হয়েছো, যত বাজেই লাগুক না কেন কাজটা মনোযোগ দিয়ে করে উচিত।"

সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আলাপচারিতায় এই কথা শোনার পরে কথাটি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলি। ভালো খারাপ তো মানুষ ঠিক করবে। আমি তো শুধু চরিত্রে অভিনয় করে চলেছি।

একাধারে যেমন ঋতুপর্ণ ঘোষ, কৌশিক গাঙ্গুলী, সৃজিত মুখার্জির ছবিতে অভিনয় করেছি, সৌমিত্র বাবুর সঙ্গে নাটকে উনি কিং লিয়ার হয়েছেন আমি গ্লস্টার হয়েছি। টানা ৪ বছর চলেছে সে নাটক। আবার তেমনি মাচা করেছি, যাত্রা করেছি, পাড়ার নাটক, অফিসের নাটক, স্কুলের রিউনিয়ানে নাটক কি না করেছি।

● নাটক না টিভি ?

●● নাটকের একটা আলাদা মজা আছে। যাদের জন্য আমার ১০০ ভাগ আমি স্টেজের ওপরে দিচ্ছি তাঁরা সকলে আমার সামনে বসে। একসঙ্গে এতগুলো মানুষের হৃদস্পন্দন, একটা বাকরুদ্ধ পরিবেশ, আমি স্টেজে ডায়লগ বলছি, মানুষ সামনে অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, আমার প্রত্যেকটি মুখের রেখা যেন তারা দেখতে পাচ্ছে, এর একটা আলাদা উত্তেজনা আছে, একটা অন্য রকম উচ্ছাস আছে যেটা টিভির পর্দায় অভিনয় করলে কোনোদিন অনুভব করা যায় না। ২৫ বছর ধরে নাটক করছি। এখনও যেন প্রতিদিন নতুন করে প্রেরণা পাই।

● আর যাত্রা?

●● যাত্রা ব্যাপারটা বড় ছোট করে দেখা হয় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। এটা খুব দুঃখের।

আমি যাত্রা করতে গিয়ে দেখেছি, একজন কৃষক, সে মাঠে ধান চাষ করে, সেই ভাবেই সে জীবন নির্বাহ করে. সেটাই তার জীবিকা কিন্তু যাত্রার স্টেজে উঠে সে যখন অভিনয় করছে, কি অপূর্ব সেই অভিনয় শৈলী। কি দাপট তার স্টেজে। আমি অনেককিছু শিখেছি যাত্রা থেকে।

● আপনার তো এখন আরেকটা পরিচয় সিদ্ধেশ্বর মোদক।

●● আমার সত্যি অনেক সৌভাগ্য যে আমি এই চরিত্রে অভিনয় করতে পারছি। এতো দারুন একটা টিম। এতো ট্যালেন্টেড জুনিয়ার আর্টিস্ট সব। আমার তো দারুন লাগছে। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। আমরা হৈ হৈ করে কাজ করি। শুটিংয়ের বাইরে আড্ডা হয় ভরপুর। আমি আমার জুনিয়রদের থেকে শিখি হয়তো ওরাও আমার থেকে শেখে, কিন্তু মজা করে কাজ করি।

● এতো এনার্জি কোথায় পান ?

●● আমি ডয়াবিটিক। জোরালো ইন্সুলিন নি প্রতিদিন। কিন্তু কি জানো? আমি যেটা ভালোবাসি সেটা করে চলেছি বলে আমার ক্লান্তি আসে কম। এটা আমার ছোটবেলার ভালোবাসা। আমি যেন বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি।

● নেগেটিভ ক্যারেক্টার করতে কেমন লাগে?

●● আরও বেশি চ্যালেঞ্জ মনে হয় যেন। আমি যা নই সেটা ফুটিয়ে তুলতে হবে আমাকে। মনে নেই ঋতুপর্ণ ঘোষের 'অন্তরমহল' ছবি? সেই দুরাচারী ব্রাহ্মণ পুরোহিত। যে নাকি সঙ্গম কালে মন্ত্র পাঠ না করলে ছেলে জন্মাবে না বংশে? সেই ছবিটি দেখার পরে অনেকেই আমায় এসে বলেছিলো সেই সময়, 'মনে হচ্ছিল পুরোহিতটাকে গিয়ে দু' ঘা দিয়ে আসি' আমি হেসে নিজেকে বলেছিলাম, যাক আমার অভিনয়ে তার মানে কোনো খুঁত ছিল না!

● এতো জুনিয়ার আর্টিস্টদের সঙ্গে কাজ করছেন? ভয় করে না কখনও যে স্টেজ এবারে এদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে?

●● সময়ের প্রবর্তনে পরিবর্তন তো ঘটবেই। সে তো অনিবার্য্য। আমাদের রুপোলি জগতে আজকাল ভালোটাই বেশি। একটা ভালো উপার্জনের জায়গা। এখন বহু ছেলেমেয়ে কাজ করছে। কি ভালো কাজ করছে তারা। কিন্তু আমায় এখন অবধি কাজ নেই বলে বসে থাকতে হয়নি। এই জগতে বয়েস হয়ে যাওয়া মানে ফুরিয়ে যাওয়া নয়। বরং নতুন চরিত্র পাওয়া। এক এক বয়েসে এক এক রকম চরিত্র। তাই তো বলি, যতদিন পারবো, অভিনয় করবো। আমরা কি সবাই তাই করছি না? আমি হয়তো সর্ব সম্মুখে, কেউ বা সবার অলক্ষে।

Satarupa Bose Roy

‘বর্তমান যুগের পরিচালকদের মধ্যে আর-একটা হীরক রাজার দেশে বানানোর মতো মেধা ও সৃজনশীলতা নেই।’

অভিযাত্রিক। বহুল প্রশংসিত এই সিনেমাটি ২০২০ সালে পাব্লিক প্রিমিয়ারের আগেই দক্ষিণ এশিয়ার সেরা পাঁচটি সিনেমার তালিকায় নিজের জায়গা করে নেয়। ২০২১-এ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের পরে এই অনবদ্য সিনেমাটির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। ২৬টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার, ৪২টি আন্তর্জাতিক মনোনয়ন, ১৮টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আনুষ্ঠানিক নির্বাচন। ৬৮তম ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডে দুটি উল্লেখযোগ্য বিভাগে পুরস্কৃত হয় অভিযাত্রিক, সেরা বাংলা সিনেমা ও শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফি বিভাগে। অভিযাত্রিকের যাত্রা নিয়ে পরিচালক **শুভ্রজিৎ মিত্রের** সঙ্গে কথা বললেন **অগ্নিভ সেনগুপ্ত**।

● পরিচালক হয়ে ওঠার নেপথ্যে আপনার বাড়ির প্রভাব কতটা?

●● যেমন সকল মধ্যবিত্ত বাড়িতেই হয়ে থাকে, সিনেমা-জগতের প্রতি আমাদের বাড়িতেও একটা ট্যাবু ছিল। বাড়ির ছেলে সিনেমাকে পেশা হিসাবে বেছে নেবে, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আমার বাবা কিছু সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু বাড়ির নিষেধে কখনো যেতে পারেন নি।

ছোটবেলা থেকেই আমার গল্প বলতে ভালো লাগত। স্কুলের ম্যাগাজিনে নিয়মিত লিখতাম। তখন হেয়ার স্কুলে পড়ি, ক্লাশ সিক্স কি সেভেন হবে, বাবা ই-টি দেখাতে নিয়ে গেলেন। সিনেমা শেষ হল, কিন্তু সেই রেশ মনের মধ্যে রয়ে গেল অনেকদিন। সেইখান থেকেই অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ তৈরী হল। একটু বড় হলাম, প্রচুর সিনেমা দেখতাম, মূলত বিদেশী সিনেমা। গল্প বলার প্রতি আগ্রহ এবং অডিও-ভিস্যুয়ালের প্রতি আকর্ষণই এই পেশাকে বেছে নেওয়ার প্রধান অনুপ্রেরণা।

● সিনেমায় হাতেখড়ি অভিনয়ের মাধ্যমে, পরিচালক হওয়ার অনুপ্রেরণা কি ভাবে পেলেন?

●● অনেক ছোটবেলায় ডিডি ২-তে সুকুমার রায়ের যতীনের জুতো টেলিফিল্মে নাম-ভূমিকায় অভিনয়

করেছিলাম। আমার ই-টি মন্ত্রমুগ্ধতা-পূর্ববর্তী সময়ে হবে হয়তো। সেই সময়ে, স্বাভাবিকভাবেই, অভিনেতা হব নাকি পরিচালক হব এতো ভাবার মত পরিণত ছিলাম না। কিন্তু, যেমন বললাম, গল্প বলার প্রতি আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই ছিল। তাই, যখন পরিণত হলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে চলচ্চিত্র-জগতকেই পেশা হিসাবে বেছে নেব, কখনোই অভিনেতা হওয়ার কথা ভাবিনি। আমার মনে হয়, থিয়েটারের মূল আধার অভিনেতা এবং চলচ্চিত্রের মূল আধার পরিচালক। অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে আমি মানুষকে গল্প বলতে চাই। আমার সেই ইচ্ছাকে পরিচালনাই চরিতার্থ করতে পারে।

● মন আমোর শেষের কবিতা রিভিজিটেড - শেষের কবিতাক নতুন আঙ্গিকে দেখা। অভিযাত্রিক - অপুর সংসারের সিক্যুয়েল। ক্লাসিককে নতুন আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কি ছিল?

●● মন আমোর আর অভিযাত্রিকের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। মন আমোর শেষের কবিতার প্রকল্পিত সম্প্রসারণ। অভিযাত্রিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজিত-র শেষাংশের অ্যাডাপ্টেড স্ক্রীন-প্লে। তাই মন আমোরের সঙ্গে অভিযাত্রিকের তুলনা টানা যায় না কোনভাবেই।

অভিযাত্রিক বানানোর সময়ে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল সেই সময়টা পুনঃনির্মাণ করা। ১৯৫০-এ দশকে দাঁড়িয়ে ১৯৩০-এর দশককে পুনঃনির্মাণ করতে সত্যজিৎ রায়কে যত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে

হয়েছিল, ২০২২-এ দাঁড়িয়ে সেই চ্যালেঞ্জটা বহুলাংশে বেড়েছে। আমি এমনিতেই খুব খুঁতখুঁতে স্বভাবের। প্রচুর রিসার্চ করতে হয়েছে সেই সময়টাকে নিয়ে। মনের মতো স্পট পেতে প্রচুর রেকি করেছি। আমার সম্পূর্ণ ইউনিটের প্রত্যেকের সাহচর্য্য এবং সহায়তা ছাড়া তা সম্ভব হত না।

● অভিযাত্রিকে অতি সচেতনভাবে সত্যজিৎ রায়ের প্রভাব যেমন এড়িয়ে গেছেন, তেমন বিভূতিভূষণের মূল উপন্যাস থেকেও কিছুটা সরে এসে এক নতুন আঙ্গিক দিয়েছেন। অন্যরকম করার চেষ্টা ব্যাকফায়ার করতেই পারত। বিশ্বাস রেখেছিলেন কি ভাবে?

●● অবশ্যই, নির্দেশক হিসাবে স্বকীয়তা বজায় রাখতে চেয়েছিলাম উপন্যাসের মূল নির্য্যাসকে অক্ষুণ্ণ রেখে। যেমন, অভিযাত্রিকে শঙ্করের চরিত্র। মূল উপন্যাসে অপরাজিতের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক ইয়োরোপীয় পর্যটকের। আমি সেখানে ভাবলাম, শঙ্করের মতো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট এক বাঙালী ভূপর্যটক থাকতে ইয়োরোপীয় চরিত্র ব্যবহারের প্রয়োজন কোথায়? কিংবা, সেই দৃশ্যটা যেখানে কাজল বাইরে গেছে, এবং সেই মূহুর্তে

বৃটিশ পুলিশ রাস্তায় গুলি চালাচ্ছে। দৃশ্যের মূল নির্য্যাস ছিল কাজলের প্রতি অপুর সন্তানকে হারিয়ে ফেলার উদ্বেগ এবং অপত্য স্নেহ, যা মূল উপন্যাসে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

চিত্রনাট্য লিখে তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায়, মানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতিকে দেখিয়েছিলাম। উনি সম্মতি জানিয়েছিলেন।

● অভিযাত্রিক কিছুটা অপুর গল্প, কিছুটা কাজলের, আবার কিছুটা শঙ্করেরও। ন্যারেটিভ এবং চরিত্রায়ণের আতিশয্যে অনেকক্ষেত্রে মূল বক্তব্য চাপা পরে যায়, যেটা আমরা অভিযাত্রিকে দেখিনি। চিত্রনাট্য লেখার সময়ে কি এই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন?

●● অভিযাত্রিক প্রধানত বাবা ও ছেলের যাত্রার গল্প। কোন মহান বার্তা দেওয়ার দায় আমার নেই, আমি শুধু একটা গল্প বলতে চাই সিনেমার মাধ্যমে। অভিযাত্রিকেও সেই চেষ্টাই করেছি। অবশ্যই, গল্পের

প্রয়োজনে পার্শচরিত্র এবং উপকাহিনী এসেছে, কিন্তু বাবা-ছেলের যাত্রার গল্প, আর ধীরে-ধীরে অপুর বন্ধু থেকে বাবা হয়ে ওঠার উত্তরণের গল্পকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

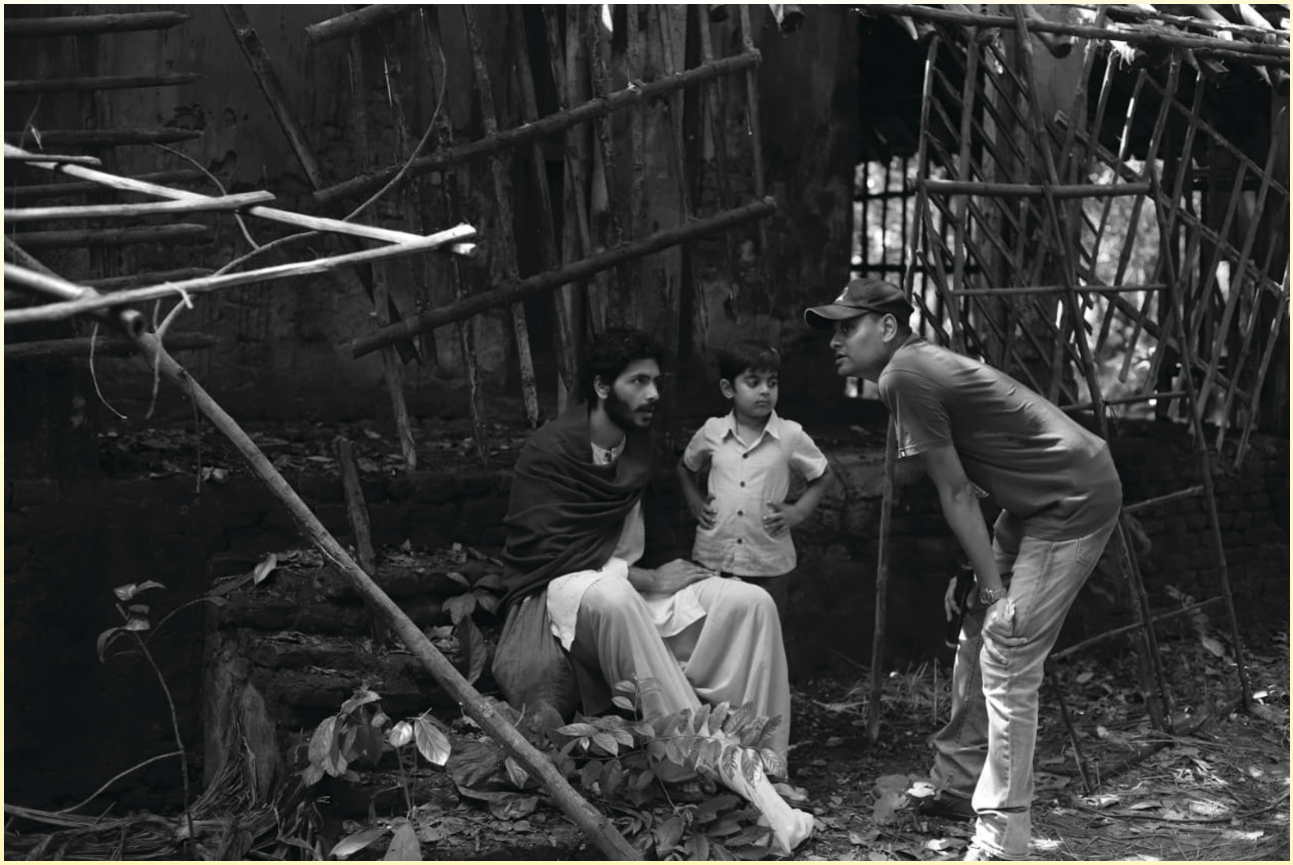

করেছে অভিযাত্রিক। তাদের সেই বাইরের এবং অন্তরের অভিযান যাতে ফুটে ওঠে, চিত্রনাট্য লেখার সময়ে অবশ্যই সেই দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলাম।

এক ইন্টারভ্যুতে বলেছিলেন যে বাংলায় সামাজিক-রাজনৈতিক সিনেমা বানানোর সমর্থন নেই। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার পরতে-পরতে রাজনৈতিক আখ্যান। সাম্প্রতিক অনীক দত্তের 'ভবিষ্যতের ভূত' বা কৌশিক গাঙ্গুলীর 'লক্ষী ছেলে'-তেও আমরা রাজনীতির রং দেখতে পাই। সেই প্রেক্ষিতে আপনার বক্তব্যের আধার যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।

আমি ইদানীং সময়ের কথা বলেছি। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেনের সেই প্রতিভা এবং বুদ্ধিমত্তা ছিল, এবং তৎকালীন সময়ে গঠনমূলক সমালোচনা রাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তাই আমরা হীরক রাজার দেশে, মেঘে ঢাকা তারা বা কলকাতা ৭১-এর মতো সিনেমা পেয়েছি। ইদানীং সময়ে রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রচন্ডভাবে পোলারাইজড - তুমি এখন হয় কারোর পক্ষে কিংবা তার বিপক্ষে। স্বাধীন চিন্তন স্বীকৃত নয়। সেন্সর বা বয়কটের প্রাবল্য। সেই আবহাওয়ায় আর, সবচেয়ে বড় ব্যাপার, বর্তমান যুগের পরিচালকদের মধ্যে আর-একটা হীরক রাজার দেশে বানানোর মতো মেধা ও সৃজনশীলতা নেই। আমিও সেই দলেই পরি।

● আপনার সংগ্রহে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপি আছে, এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার পোস্ট থেকে বোঝা যায় যে পুরাণের উপরে আপনার বিশেষ আগ্রহ আছে। কোন পৌরাণিক সিনেমা বানানোর কথা ভেবেছেন?

●● ঠিক পুরাণ নয়, তবে ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর উপরে আমার আগ্রহ আছে। আমার সিনেমার গল্প নির্বাচনেও তার ছাপ থাকে। যা কিছুর ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তাই আমার কাছে প্রবল আগ্রহের বিষয়। ঘটনাক্রমে, আমার পরবর্তী সিনেমাতেও ইতিহাসের ছোঁয়া থাকছে। যেহেতু এখনো প্রি-প্রোডাকশন পর্যায়ে আছে, তাই সেই ব্যাপারে বেশী কিছু বলতে পারব না, কিন্তু সবার নিশ্চয়ই সিনেমাটা পছন্দ হবে। সেখানে আপনারা বাঙালীর কিছু প্রিয় ঐতিহাসিক চরিত্র এবং সময়কে খুঁজে পাবেন।

মা, বাবা ও অভাগিনী

অরুণাশিস সোম

প্রেমের আগুন জানান দিতেই ঝড় নেমেছে গাছে,
মেয়ের কথার দাম ছিলো না মা ও বাবার কাছে !

মা বোঝেনি প্রেমিক কবি ব্লগ বানালো লেখার,
ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ পেলে কেউ হত না বেকার!

বাবার তুমুল চোখরাঙানি, ঘা লেগেছে আঁতে,
অহংকারে মন দিলো না মেয়ের শুশ্রূষাতে!

মেয়ের স্পষ্ট হুমকি ছিলো, পালিয়ে যাবে দূরে,
কিন্তু শেষে সাহস ফুরোয় একলা হৃদয় খুঁড়ে!

তুফান এলে কে বা এখন মাপছে গতি হাওয়ার?
রাস্তা বহু নিরুদ্দেশের, একটা খুঁজে পাওয়ার!

গভীর রাতে স্বপ্ন পারদ, পিছলে গেছে সুখে-
কমবয়েসী বাধ্য মেয়ের প্রেম ভেঙেছে বুকে!

দুঃখ জমে পাথর হতেই ভিড় বেড়েছে কত,
বাবার প্রিয় জামাই আসে, মায়ের "ছেলের মত"!

মায়ের সুরে মেঘ ডেকেছে, হিসেব শুরু ক্ষয়ের,
মিথ্যে হাসির মধ্যে কিছু সত্যি অভিনয়ের!

The Boy and the Alien

Arjun Choudhury

Chapter 1:BLAST OFF!

"OK! Have I ever told you of the time I went to space?" said Grandpa.

"No" said Nora

"Then, here we go." – Grandpa said

* * *

It was the year 2008 – the same year that an asteroid was about to hit the Earth. Me and my friends, Gloria and Toby, were sent on a very important mission – to go to space and stop it before it was too late.

While my friends and I were sitting comfortably in the spacecraft Moderna, at HQ, it was absolute chaos.

"Countdown has begun"- said George.

"10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..BLAST OFF", ans with that, George pressed the LAUNCH button.

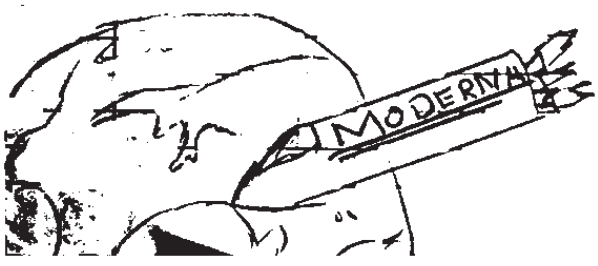

It wasn't long before we reached outside the atmosphere. But as soon as we did, we had a big problem in our hands. Gloria was the first to notice…that we were about to crash. Everyone was panicking, and it didn't end well.

I managed to survive somehow, but I was also the only one to survive; the rest of the crew didn't survive. The important thing was, I had to find a way off the moon. The only way I would get off there was to explore. I explored for days and days until I came across this alien city. I took out my binoculars and saw these tiny green people – they had HUGE heads and were EVERYWHERE. I was curious.

As soon as I turned around, one of them was right in front of me.

I think it was curious too – "What is this creature? What is this creature doing here?" At least, that is how I would feel if I were him.

Finally, it spoke – "HELLO! WHAT IS YOUR NAME?", said the alien. This took me by surprise. I didn't expect it to speak English. I didn't know what to say. So I just said "H-he-elo, um..., m-my n-name i-i-s Ben."

Chapter 2: Best Friends

It took many days to fix the spacecraft, and that allowed the span for us to build a bond - a strong friendship.

He gave me a tour around the city; we watched the shooting stars. I also found out a fact. We call the moon as “the Moon”; but they call it “Earth”. It was fun while it lasted. I learnt a lot during my stay there. I even managed to learn their language. They called themselves “Moon Dancers”.

I hoped that I could stay longer – but I had an asteroid to stop.

Chapter 3: Say your Goodbyes

by Author

It was time for me to say my goodbyes.

“GOOD BYE BEN”.

“Goodbye fellow moon-dancer. Hope I see you again”

“ME TOO”

“Now, I have a planet to save”

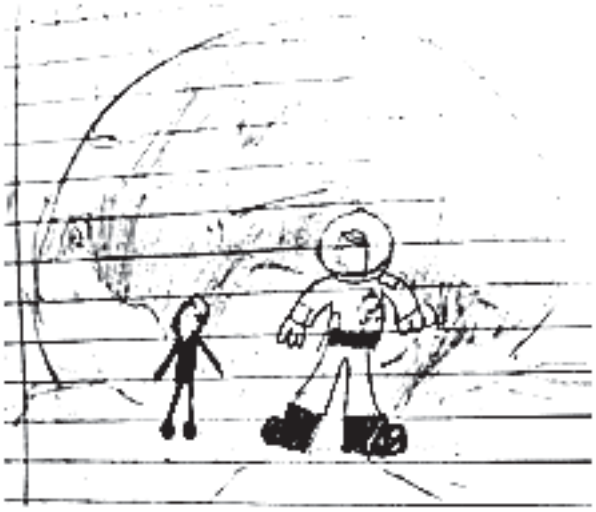

I pressed the launch button, and I went UP, UP, UP.

I headed towards the asteroid; but, before I got there, I noticed something lying on the ground. It was a remote of some sort, with a note attached. It said “Dear Ben,

I hope that you’ll use this well. I hope it’ll help with your mission”

So, I pressed the red button on the remote. As soon as I clicked it, a machine came out of nowhere. It shot a laser – straight at the asteroid. The asteroid just disappeared – no sign of either the asteroid or the machine after that.

I safely made my way back to Earth.

Chapter 4: Back Home

Everyone was amazedwhen I told them about my stay on the moon.

I had a meeting with John Sullivan, the administrator of NASA at that time. He was so amazed by my story that he made me the Head of the Alien Department.

“Grandpa, I have a question”, said Michael.

“Yes, what’s the question”, said Grandpa.

“What was the alien’s name?”, asked Michael.

“Yeah! What was his name?”, said Nora.

Grandpa answered – “Hmm…I never knew his name. But, all I can say is that wherever he is, he is doing just fine. Now get to sleep.”

“Good night Grandpa", said both Nora and Michael sleepily. And, with that, Grandpa switched off the lights and went to bed.

ALPHABET IN MOON-DANCIAN

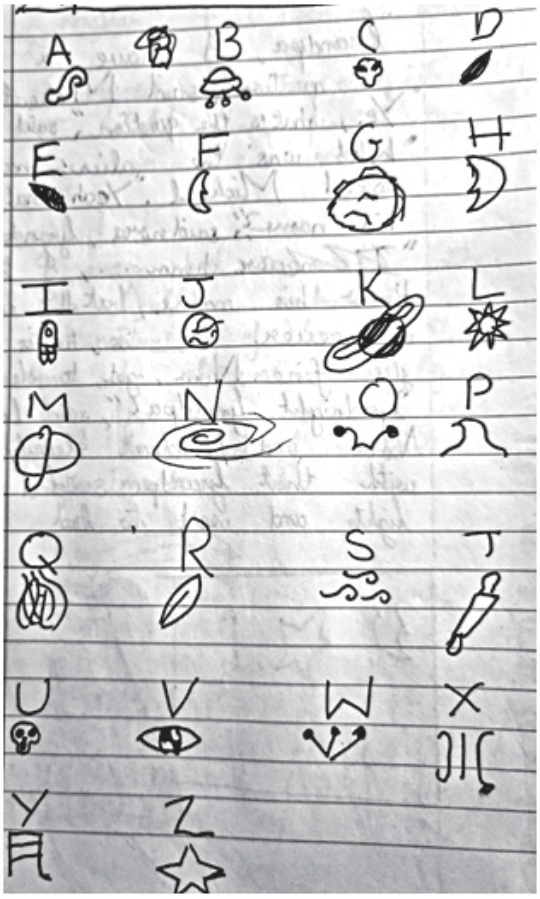

MAKE YOUR CHILD FUTURE-READY!

CODING & ROBOTICS FOR KIDS
• LIVE • ONLINE • 1-ON-1 •

Personalised courses to suit every child's pace

Top Teachers with Computer Science degrees

Loved by parents working for

Shell · amazon.com · vodafone · Deloitte. · G · BARCLAYS · Booking.com

Learn Coding Games with Roblox & Minecraft

Europe's Best Coding Academy for Kids (Age 6-16)

JET learn

Exclusive 25% Off

Sign up for a FREE trial class

www.jetlearn.com +44 7578 147397

IMPOFREIGHT®

NETHERLANDS B.V.

Europe's fastest growing freight forwarding company is privileged to be the logistics partner of Holland e Hoi Choi this Durga Mahotsav' 22

‼ বাজলো তোমার আলোর বেণু ‼

OUR STRENGTH IS OUR ASSURANCE OF PROVIDING THE BEST LOGISTICS SOLUTION AT THE MOST COMPETITIVE PRICE TO OUR CLIENTS !!

HANDLING SEA FREIGHT, AIR FREIGHT , WAREHOUSING, ROAD TRANSPORTATION. HAULAGE, CUSTOM CLEARANCE FROM ANY PART OF EUROPE TO REST OF THE WORLD

IMPOFREIGHT NETHERLANDS B.V.

JOOP GEESINKWEG 501, 1114AB, AMSTERDAM - DUIVENDRECHT NETHERLANDS

KVK : 80346049/ VAT : NL861639728B01/ PHONE : +31-684994918

EMAIL: KOYEL@IMPOFREIGHT.NL/ WEBSITE : WWW.IMPOFREIGHT.COM

PAINTING

Shreyashi Danda

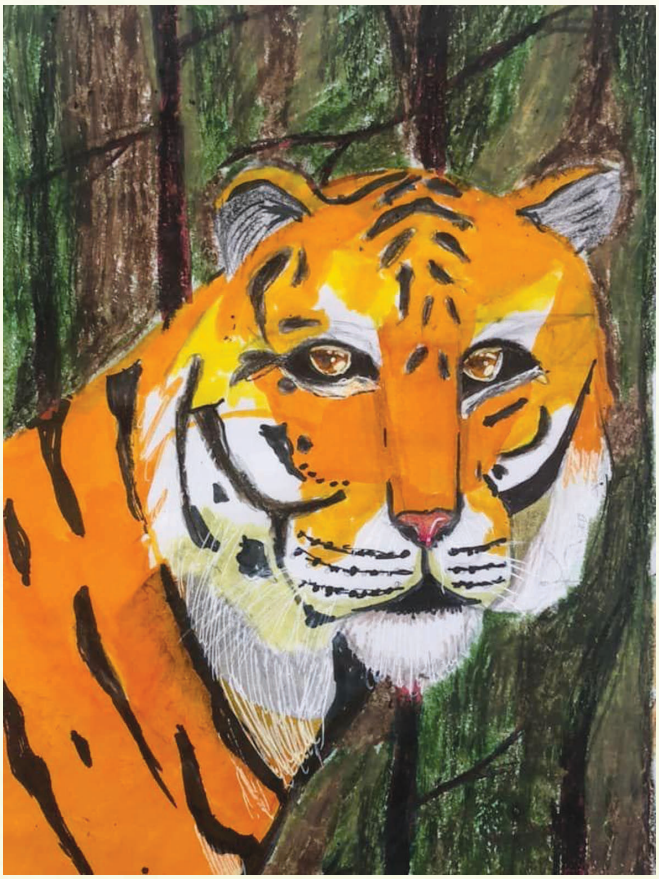

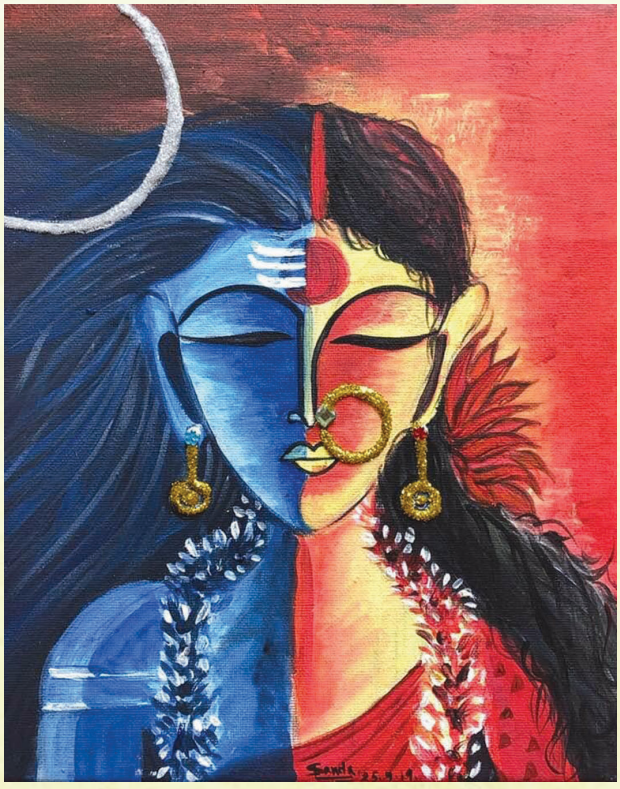

Laxmi by Colour Your Dreams

(Anindita Bhattacharya)

FLASH SALE
SATURDAY
Navami Evening
with
ARKO
and friends
DURGAPUJO

CUSTOMER CARE
9830460803

ZEDD'S

KURTIS • TOPS • GOWNS

SIZES L - 8 XL

+

Lifetime FREE Alterations

GARIAHAT	EKDALIA	GARIA	BEHALA
40043543	46010683	46010813	9073866120

biswa bangla

where the world meets bengal

Dokra lamp inspired by the Mari-Cha lion, an 11th or 12th century South Italian bronze sculpture

Feel connected

Biswa Bangla is the heart of Bengal's folk aesthetics and creativity. The sheer artistry of the artisans and weavers of Bengal will take your breath away and connect you to the rhythm and life of a whole people

BISWA BANGLA STORES IN KOLKATA: KOLKATA AIRPORT, DHAKURIA-DAKSHINAPAN, PARK STREET, RAJARHAT

OTHER LOCATIONS: BAGDOGRA AIRPORT, DARJEELING, NEW DELHI, HYDERABAD

Biswa Bangla is an initiative of the Department of Micro, Small and Medium Enterprises & Textiles, Government of West Bengal

www.biswabangla.in